ইসলাম

অ্যা কমপ্লিট কোর্স ফর বিগেনারস

ইয়াহিয়া এমেরিক

অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর

১

(ইসলাম ও কুরআনের পরিচয়)

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

অধ্যায়-১

কুরআন গবেষণায় দক্ষতা

কীভাবে ইসলাম সম্পর্কে অধ্যয়ন করব ১৫

অনুবাদ কী ২১

লিপান্তর বা অক্ষরীকরণ কী ২৫

কুরআনকে কীভাবে কাজে লাগাব ২৮

অধ্যায়-২

কুরআনের সঠিক উপলব্ধি

কুরআন কীভাবে নাজিল হয়েছিল ৩৫

কুরআন কীভাবে সংরক্ষিত হয়েছিল ৩৯

কুরআন অপরিবর্তনীয় গ্রন্থ ৪৩

মুজিজাসংবলিত গ্রন্থ ৪৮

কুরআন ও বিজ্ঞান ৫৩

অধ্যায়-৩

সৃষ্টি বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি

মহাবিশ্বের সৃষ্টি ৬৭

ইসলাম এবং ডাইনোসোর ৭৯

মানুষের আদি উৎস ৮৭

আমরা কেন এখানে ৯৯

অধ্যায়-৪

ইসলাম কী

ইসলাম মূলত কী ১১৫

মুসলিম কে ১৩২

কিছু মানুষ অবিশ্বাসী কেন ১৪৩

কীভাবে ইসলাম সম্পর্কে অধ্যয়ন করব

এই আলোচনায় ফোকাস করা হয়েছে—ইসলাম সম্বন্ধে পড়াশোনা করার সর্বোত্তম উপায় কী।

ইসলাম কী

'ইসলাম' এমন একটি জীবনপদ্ধতি, যা গোটা বিশ্বে প্রায় দুই বিলিয়ন মানুষ অনুসরণ করে। সাধারণভাবে যারা ইসলাম অনুসরণ করে, তাদের বলা হয় মুসলিম। বিশ্বে ৫০টিরও বেশি দেশে মুসলিম জনগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ। বিশ্বজুড়ে মুসলিমদের সংখ্যা প্রতিবছরই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

'ইসলাম' মূলত একটি আরবি শব্দ। এর অর্থ 'শান্তি এবং আত্মসমর্পণ'। ইসলামের একটি শাব্দিক সংজ্ঞায়ন হলো—যখন আপনি নিজেকে আল্লাহর ইচ্ছার সামনে পুরোপুরি সমর্পণ করতে পারবেন, তখনই কেবল অন্তরে শান্তি অনুভব করবেন। অর্থাৎ একজন মুসলিম হলেন তিনি; যিনি আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং এর বিনিময়ে খুঁজে পান শান্তি।

ইসলাম নিছক কোনো ধর্ম নয়; বরং একটি পরিপূর্ণ জীবনপদ্ধতি। গোটা মহাবিশ্বই সহজাত ও প্রকৃতিগতভাবে অনুসরণ করে ইসলামকে। ইসলামের উদ্দেশ্য হলো–প্রকৃতি ও অস্তিত্বের প্রাকৃতিক বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি জীবনযাপনে মানুষকে সহায়তা করা।

বিলিয়ন বিলিয়ন বছর আগে আল্লাহ তায়ালা এই মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রণয়ন করেছেন একটি প্রাকৃতিক বিধানও এবং গোটা বিশ্বের সকল উপাদান ও উপকরণকে তাঁর ইচ্ছার আলোকেই পরিচালিত হওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এই বিবেচনায় আমরা গোটা মহাবিশ্বকেই মুসলিম বলতে পারি। কেননা, তা আল্লাহর ইচ্ছার নিকটই আত্মসমর্পণ করেছে।[১]

কিছু কিছু গ্রহে বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ তায়ালা জীবন্ত প্রাণীর বিকাশ ঘটিয়েছেন। এমনই একটি গ্রহ পৃথিবী। এখানে খুবই কার্যকর একটি বাস্তুসংস্থানের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এর মাধ্যমে আল্লাহ প্রাণিজগতের ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যবস্থা করেছেন।

[১] সূরা ইবরাহিম : ১৯-২০

পৃথিবী সৃষ্টি করার অনেকটা সময় অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা মানুষ সৃষ্টি করার ইচ্ছা পোষণ করেন। তারা ইতঃপূর্বে পৃথিবীতে আগত অন্য সকল প্রাণী থেকে আলাদা। তাদের বুদ্ধিমত্তা আছে, স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আছে।

বিড়াল, বানর, মাছ, ব্যাঙ বা গাছ–কেউই তাদের সহজাত প্রবৃত্তি এবং প্রকৃতির নির্দেশনার বাইরে গিয়ে কিছু করতে পারে না। কিন্তু মানুষকে তার মতো করে জীবনযাপনের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। মানুষের ওপরও প্রবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়ের প্রভাব রয়েছে। তবে তা অন্য প্রাণীর তুলনায় অনেকটাই শিথিল।

আমাদের উদ্দেশ্য কী

মানুষকে মুক্ত জীবনযাপন করার যে সুযোগটি দেওয়া হয়েছে, তার কিছু পরিণতিও আছে। আল্লাহর সৃষ্টি মহাবিশ্বে কোনো অনিয়ম নেই,। নেই কোনো বিশৃঙ্খলাও। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে পুরো হিসাবটাই অন্যরকম। সমাজের চলমান ধারাবাহিকতায় মানুষ চাইলে শান্তিপূর্ণ বিধিবিধান মেনে চলতে পারে। আবার নেতিবাচক পথে চলে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে ধ্বংসের দিকেও। করতে পারে নিজের ভেতরকার পাশবিক প্রবৃত্তির চাষাবাদ।

খুব সংক্ষেপে বলা যায়—মানুষ ইচ্ছে করলে উৎকৃষ্ট বিধানগুলো মেনে চলতে পারে। আবার নিম্নস্তরে ধাবিত হয়ে নেমে যেতে পারে বুদ্ধিবৃত্তিহীন পশুত্বের পর্যায়েও। আল্লাহ চান, মানুষ তার আবেগ ও বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে এই মহাবিশ্বের অন্তর্নিহিত প্রকৃত সত্যের সন্ধান করার চেষ্টা করবে। লোভ-লালসা, সহিংসতা বিসর্জন দিয়ে জয় করতে পারবে নিজের ভেতরে থাকা পাশবিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে।[২]

সত্যের সন্ধানে মানুষের এই যাত্রায় সহযোগিতা করার জন্য আল্লাহ মানুষের মধ্য থেকেই কিছু পথ নির্দেশক বেছে নিয়েছেন, যাদের বলা হয় নবি ও রাসূল। আল্লাহ তাঁর যাবতীয় বার্তাগুলো নবি-রাসূলগণের মাধ্যমেই প্রাথমিকভাবে পাঠাতেন। আর তাঁরা তা পৌঁছে দিতেন সাধারণ মানুষের কাছে।

নবিগণ ছিলেন ঝড়ের মাঝে উজ্জ্বল বাতিঘরের মতো। তাঁরা এই সমস্যাগ্রস্ত পৃথিবীতে মানুষকে মুক্তির দিকে আহ্বান জানাতেন। কোনো কোনো নবির কাছে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বার্তাগুলো লিপিবদ্ধ ও গোছানো অবস্থায় পাঠিয়েছেন। এভাবে লিপিবদ্ধ বার্তা প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল পরবর্তী প্রজন্মের মানুষ যেন এগুলো নিয়ে গবেষণা ও পর্যালোচনা করতে পারে।

কিন্তু সত্যনিষ্ঠ বার্তা পাওয়ার পরও অধিকাংশ মানুষ প্রবৃত্তির দাসত্বেই লিপ্ত থাকে। ফলে উদ্ভব হয় যুদ্ধ আর সংঘাতের। জমিনে ফিতনা, ফ্যাসাদ, বিশৃঙ্খলা, ঘৃণা আর নৈরাজ্যের বিকাশ ঘটে। এর বিপরীত অবস্থাটাই হলো শান্তি।

---

[২] সূরা জাসিয়া : ২২; সূরা আহকাফ : ৩

ইসলাম

অ্যা কমপ্লিট কোর্স ফর বিগেনারস

ইয়াহিয়া এমেরিক

অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর

২

(ইসলামি আকিদা ও বিশ্বাস)

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

অধ্যায়-১

ইসলামি বিশ্বাস : প্রথম পর্ব

আল্লাহ কে ১৫

ফেরেশতা কারা ৪৮

জিন কারা ৫৮

আল্লাহর কিতাব ৬৯

নবি ও রাসূলগণ ৮৯

অধ্যায়-২

ইসলামি বিশ্বাস : ২য় পর্ব

আমাদের জীবন কে নিয়ন্ত্রণ করেন ১১৭

আমাদের মৃত্যুর পর কী হয় ১৩২

জান্নাত কী ১৫৬

জাহান্নাম কী ১৭০

আল্লাহ কে

এই আলোচনায় ফোকাস করা হয়েছে—আল্লাহকে আমরা কীভাবে জানব।

প্রাথমিক কিছু বিশ্বাস

গোটা মানবেতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়—মানুষ বারবার নিজেদের জীবনের অর্থ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিস্মিত হয়েছে। মানুষকে আল্লাহ তায়ালা পরীক্ষা করার জন্য দুনিয়ায় স্বাধীন করে প্রেরণ করেছেন। তারা ইচ্ছে করলে তাঁকে গ্রহণ করতে পারে আবার বর্জনও করতে পারে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> ‘আর যেখানে বাঁকা পথও রয়েছে, সেখানে সোজা পথ দেখানোর দায়িত্ব আল্লাহর ওপরই বর্তায়। তিনি চাইলে তোমাদের সবাইকে সত্য-সোজা পথে পরিচালিত করতেন।’[৩]

কিন্তু প্রশ্ন হলো—আল্লাহ কে? তিনি কী? কীভাবে আমরা সেই সত্তাকে চিনতে পারব, যিনি সামান্য মৌখিক আদেশ দিয়ে বিলিয়ন বিলিয়ন গ্যালাক্সি তৈরি করতে পারেন? কেননা, কেবল আল্লাহরই এই ক্ষমতা রয়েছে। আল কুরআন বলছে—

> ‘তিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর স্রষ্টা। তিনি যে বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেন, সে সম্পর্কে কেবল হুকুম দেন ‘হও’, তাহলেই তা হয়ে যায়।’[৪]
>
> ‘কোনো জিনিসকে অস্তিত্বশীল করার জন্য এর চেয়ে বেশি কিছু করতে হয় না যে, তাকে হুকুম দিই “হয়ে যাও” এবং তা হয়ে যায়।’[৫]

মানুষ তার সৃষ্টিকর্তা নিয়ে সব সময়ই বিস্ময়ের ঘোরে আবদ্ধ ছিল। নানা সময়ে নানা জাতির ইতিহাসে দেখা যায়—মানুষ বিভিন্ন ধরনের ছবি ও মূর্তি বানিয়ে তাদেরকেই সৃষ্টিকর্তা হিসেবে গণ্য করেছে।

---

[৩] সূরা নাহল : ৯
[৪] সূরা বাকারা : ১১৭
[৫] সূরা নাহল : ৪০

আবার কোনো কোনো অঞ্চলে মানুষ সৃষ্টিকর্তা বলতে অসংখ্য দেবতাকে বিবেচনা করেছে এবং একেকজন দেবতাকে একেক ধরনের ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে ভেবেছে। মহান আল্লাহ এ প্রসঙ্গে কুরআনে বলেন—

> 'আর তারা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন সব সত্তার পূজা করে, যাদের না আকাশ থেকে তাদের কিছু রিজিক দেওয়ার ক্ষমতা ও অধিকার আছে, না পৃথিবী থেকে? কাজেই আল্লাহর জন্য সদৃশ তৈরি করো না। আল্লাহ যা জানেন, তোমরা তা জানো না।'[৬]

মেক্সিকোতে ইতঃপূর্বে বসবাসকারী আজতেক জনগোষ্ঠী কুয়েতজেকোয়াতলের উপাসনা করত। গ্রিকদের ছিল ক্রোনাস, রোমানদের ছিল জুপিটার এবং চীনা জাতির কাছে উপাস্য হিসেবে ছিল ত্রি। শুধু তা-ই নয়, এ পৃথিবীতে যতগুলো সভ্যতার আবির্ভাব ঘটেছিল, তারা সকলেই নিজেদের মতো করে একজন সৃষ্টিকর্তা বা উপাস্যকে কল্পনা করে নিয়েছিল।

প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের দিক থেকে বিচার করলে সবচেয়ে পুরোনো যে বিশ্বাসের প্রতীকী নিদর্শন পাওয়া যায়, তা হলো মাতৃ-পৃথিবীর মূর্তি। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'এ ধরনের লোকেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে দেবীর পূজা করে। তারা সেই বিদ্রোহী শয়তানের পূজা করে।'[৭]

এসব ছোটোখাটো মূর্তির নিদর্শন আফ্রিকা থেকে শুরু করে ইউরোপ ও এশিয়া; সব সভ্যতাতেই পাওয়া যায়। সেই সময়ের মানুষ বিশ্বাস করত—পৃথিবীর উর্বরতা এবং মেয়েদের সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষমতার মধ্যে দেবতার নিদর্শন রয়েছে। আবার তারা এমন দেবতাকেও বিশ্বাস করত, যারা দাফন এবং অন্যান্য প্রাণীদের জন্ম দেওয়ার সাথে সম্পৃক্ত ছিল।

প্রথম মানবসম্প্রদায়

আমরা এরই মধ্যে জেনেছি—আদম ও হাওয়া (আ.) ছিলেন প্রথম মানব-মানবী; যারা দেখতে আমাদের মতোই দৈহিক আকৃতির ছিলেন। প্রথম মানুষ হিসেবে তাঁরাই এ ধরণির বুকে হেঁটেছেন। তাঁরা একসময় জান্নাতে ছিলেন। কিন্তু সেখানে আল্লাহর হুকুম অমান্য করায় তাঁদের বাধ্য হয়ে দুনিয়ায় আসতে হয়। এই যুগল থেকেই পরবর্তী সময়ে অসংখ্য জাত-গোত্র ও সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। মহান আল্লাহ এই সম্বন্ধে বলেন—

> 'শুরুতে সমস্ত মানুষ ছিল একই জাতি। পরবর্তীকালে তারা বিভিন্ন আকিদা-বিশ্বাস ও মত-পথ তৈরি করে নেয়।'[৮]

> 'প্রথমে সব মানুষ একই পথের অনুসারী ছিল। (তারপর এ অবস্থা অপরিবর্তিত থাকেনি,

---

[৬] সূরা নাহল : ৭৩-৭৪
[৭] সূরা নিসা : ১১৭
[৮] সূরা ইউনুস : ১৯

তাদের মধ্যে মতভেদের সূচনা হয়) তখন আল্লাহ নবি পাঠান। তাঁরা ছিলেন সত্য, সঠিক পথের অনুসারীদের জন্য সুসংবাদদাতা এবং অসত্য ও বেঠিক পথ অবলম্বনের পরিণতির ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শনকারী। আর তাদের সাথে সত্য কিতাব পাঠান, যাতে সত্য সম্পর্কে তাদের মধ্যে যে মতভেদ দেখা দিয়েছিল, তার মীমাংসা করা যায়। (এবং প্রথমে তাদের সত্য সম্পর্কে জানিয়ে দেওয়া হয়নি বলে এ মতভেদগুলো সৃষ্টি হয়েছিল, তা নয়) মতভেদ তারাই করেছিল, যাদের সত্যের জ্ঞান দান করা হয়েছিল। তারা সুস্পষ্ট পথনির্দেশ লাভ করার পরও কেবল পরস্পরের ওপর বাড়াবাড়ি করতে চাচ্ছিল বলেই সত্য পরিহার করে বিভিন্ন পথ উদ্ভাবন করে। কাজেই যারা নবিদের ওপর ঈমান এনেছে, তাঁদের আল্লাহ নিজের ইচ্ছাক্রমে সেই সত্যের পথ দিয়েছেন, যে ব্যাপারে লোকেরা মতবিরোধ করেছিল। আল্লাহ যাকে চান সত্য-সঠিক পথ দেখিয়ে দেন।'[৯]

খুব সম্ভবত মানুষে মানুষে এ বিভাজনগুলো তাদের ক্ষমতা, সম্পদ ও বিশ্বাসের ওপর ভর করেই রচিত হয়েছিল। আল্লাহ বহু আগেই আদি পিতা-মাতা আদম ও হাওয়া (আ.)-কে জানিয়ে দিয়েছিলেন—তিনি পরবর্তী প্রজন্মের কাছে নবি-রাসূল পাঠাবেন।

যদি তারা আল্লাহর প্রেরিত বার্তাসমূহ মেনে নেয় ও অনুসরণ করে, তাহলে তারা উন্নতি করবে। আর যদি তারা বিভাজিত ও বিভক্ত হয়ে যায় এবং আল্লাহর আদেশ অমান্য করে, তাহলে অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের আওতায় চলে যাবে। ফলত তাদের জন্য নির্ধারিত হবে শুধুই লোকসান। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন—

'তখন আদম তাঁর রবের কাছ থেকে কয়েকটি বাক্য শিখে নিয়ে তওবা করল। রব তাঁর এই তওবা কবুল করে নিলেন। কারণ, তিনি বড়োই ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।'[১০]

'তারপর যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বানিয়ে তাকে আল্লাহর কথা বলে প্রচার করে অথবা আল্লাহর যথার্থ আয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তার চেয়ে বড়ো জালিম আর কে হতে পারে? নিঃসন্দেহে অপরাধী কোনোদিন সফলকাম হতে পারে না। এ লোকেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের ইবাদত করছে—তারা তাদের ক্ষতিও করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে—"এরা আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী।" হে মুহাম্মাদ! ওদের বলে দাও— "তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ের খবর দিচ্ছ, যার অস্তিত্বের কথা তিনি আকাশেও জানেন না এবং জমিনেও না!" তারা যে শিরক করে—তা থেকে তিনি পাক-পবিত্র এবং তার ঊর্ধ্বে।'[১১]

---

[৯] সূরা বাকারা : ২১৩

[১০] সূরা বাকারা : ৩৭

[১১] সূরা ইউনুস : ১৭-১৮

ইসলাম

অ্যা কমপ্লিট কোর্স ফর বিগেনারস

ইয়াহিয়া এমেরিক

অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর

৩

(মৌলিক ইবাদত ও মাসায়েল)

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

অধ্যায়-১

নামাজ

ইসলামের পাঁচ স্তম্ভ ১৫

নামাজের গুরুত্ব ২২

মুয়াজ্জিনের আহ্বান ৩২

কীভাবে পাক-পবিত্র হব ৪০

নামাজের নিয়ম ৪৮

আরও কিছু নামাজ ৬০

নামাজের আরও কিছু বিষয় ৭১

অধ্যায়-২

দায়িত্ব ও অন্যান্য অনুশীলন

জাকাত কী ৮১

রোজা পালনের পদ্ধতি ৯১

হজ ১০৪

তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ১১৪

অধ্যায়-৩

ফিকাহ ও শরিয়াহ

ইসলামি আইন ১৩১

মাজহাবসমূহ ১৩৫

হালাল ও হারাম খাবার ১৪৪

হালাল উপার্জন ১৫০
অমুসলিম বন্ধুত্ব ১৫৫
বিয়ের পদ্ধতি ১৬০

অধ্যায়-৪

ইসলাম প্রতিষ্ঠা

ইসলামি শিষ্টাচার ১৬৯
মুসলিম পরিবার ১৭৪
ইসলামি সমাজ কী ১৭৯
ইসলামের রাজনৈতিক ধারণা ১৮৬
ইসলামের আলোকে জীবনযাপন ১৯৩

ইসলামের পাঁচ স্তম্ভ

এই আলোচনায় ফোকাস করা হয়েছে—ইসলামের পাঁচটি মূল স্তম্ভ কীভাবে আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করে।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান

ইসলাম হলো একটি দ্বীন, তথা জীবনপদ্ধতি। ইসলামের এটাই সঠিক সংজ্ঞায়ন। কারণ, মুসলিম হিসেবে জীবনযাপন করাটা অন্য যেকোনো মতবাদ বা আদর্শ লালন করার তুলনায় একেবারেই আলাদা। প্রশ্ন হলো—ইসলামের কোন বৈশিষ্ট্যের কারণে সাধারণ একটি ধর্মের কাঠামোতে না থেকে ইসলাম একটি জীবনপদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত হচ্ছে?

ইংরেজি শব্দ 'রিলিজিয়ন' এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'রিলিজিও' থেকে, যা দিয়ে একগুচ্ছ বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনাকে বোঝানো হয়। অন্যভাবে বলা যায়—যে বিষয়গুলো একদল মানুষকে একই ধরনের আচরণে উদ্‌বুদ্ধ করে; তা ভালো বা মন্দ যাই হোক না কেন, এটাই হলো রিলিজিও। এ কারণে খ্রিষ্টবাদ, ইহুদিবাদ, বৌদ্ধ বা হিন্দুত্বকে ধর্ম বা রিলিজিয়ন বলা হয়। কেননা, এগুলো সবই মানবিক সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত।[১২]

অন্যদিকে ইসলাম শুধু কিছু মানদণ্ড নির্ধারণ করেই ক্ষান্ত হয় না। ইসলাম এ বিবেচনার আরও ঊর্ধ্বে উঠে ভালো ও মন্দের সীমানা নির্ধারণ করে দেয়। পাশাপাশি ইসলাম যে বিশ্বাসের কথা বলে, তাকে সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে প্রয়োগ করাও এর অন্যতম দাবি। আপনি ঈমান আনবেন অথচ ঈমানি চেতনার কোনো প্রতিফলন জীবনে থাকবে না, এমনটা হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। রিলিজিয়ন বা ধর্মে এ সুযোগ আছে, কিন্তু দ্বীন ইসলামে একেবারেই নেই।

মুসলিম হওয়ার জন্য শুধু আল্লাহতে ঈমান আনাই যথেষ্ট নয়; বরং নিজেদের প্রাত্যহিক জীবনে আল্লাহর হক আদায় করাও অপরিহার্য। আর আল্লাহর হক আদায় করার একমাত্র উপায় হলো ইবাদত করা। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সাথে যে চুক্তি করেছেন, তার আলোকে ইবাদত করা আমাদের অপরিহার্য একটি দায়িত্ব। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'হে ঈমান আনয়নকারীগণ! আমি কি তোমাদের এমন একটি ব্যবসায়ের সন্ধান দেবো, যা তোমাদের কঠিন আজাব থেকে মুক্তি দেবে? তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনো এবং আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ ও জান-প্রাণ দিয়ে জিহাদ করো; এটাই তোমাদের

[১২] সূরা তাগাবুন : ৫-৬

জন্য অতিব কল্যাণকর, যদি তোমরা তা জানো। আল্লাহ তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন এবং তোমাদের এমন সব বাগানে প্রবেশ করাবেন, যার নিচে দিয়ে ঝরনাধারা বয়ে চলবে। আর চিরস্থায়ী বসবাসের জায়গা জান্নাতের মধ্যে তোমাদের সর্বোত্তম ঘর দান করবেন। এটাই বড়ো সফলতা। আর আরেক জিনিস—যা তোমরা আকাঙ্ক্ষা করো, আল্লাহ তাও তোমাদের দেবেন আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং অতি নিকটবর্তী সময়ে বিজয়। হে নবি! ঈমানদারদের এর সুসংবাদ দান করো।'[১৩]

যদি আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান আনার দাবি করি; কিন্তু তাঁর নির্দেশনা মানতে অস্বীকার করি, তাহলে তা প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়। ইসলামি জীবনযাপন করার অর্থ হলো—একজন মানুষকে প্রতিনিয়ত আল্লাহর প্রতি তার দায়িত্বগুলো স্মরণ করতে হবে। মানুষের জন্য এভাবে অভ্যস্ত হওয়া জরুরি।

কেননা, মানুষকে আল্লাহ এমনভাবে তৈরি করেছেন—একটু সুযোগ পেলেই সে তার দায়িত্বের কথা ভুলে যায়, অবহেলা করতে শুরু করে। এমনটা হয়, কেননা প্রবৃত্তি আমাদের কাবু করার চেষ্টা করে। আবার শয়তানও নানাভাবে আমাদের ওয়াসওয়াসা দিয়ে যায়। জাগতিক ব্যস্ততা, পেরেশানি আর মোহ আমাদের আল্লাহকে ভুলে যেতে যেন প্রলুব্ধ করে।'[১৪]

এ পরিস্থিতি থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে তাঁর পক্ষ থেকে সর্বশেষ হিদায়াত প্রেরণ করে একটি প্রশিক্ষণ প্রকল্প প্রদান করেছেন, যা আমাদের আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ ঘটায়। পূর্ববর্তী নবি-রাসূলগণ নামাজ বা রোজার মতো ইবাদতগুলো তাঁদের উম্মতকে শিখিয়েছেন। কিন্তু যেহেতু তাঁদের উত্তরাধিকারীরা সেগুলোর সবই ভুলে গেছে বা বিকৃত করে ফেলেছে, তাই পূর্ববর্তী ধর্মগুলো এখন রীতিমতো প্রহসনে পরিণত হয়েছে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়—এখন ইহুদি বা খ্রিষ্টানদের অধিকাংশই আর রোজা রাখে না; যদিও ঈসা (আ.) ও দাউদ (আ.) রোজা রেখেছেন। যে দু-চারজন রোজা রাখেন, তারা বছরে দু-একদিন বা দু-এক সপ্তাহ রোজা রাখেন। আর তাদের এ রোজা রাখার অর্থ হলো—চকলেট না খাওয়া, গোশত আহার না করা, প্রিয় খাবারগুলো না খাওয়া ইত্যাদি। ইহুদি বা খ্রিষ্টানদের রোজার মধ্যে এখন আর আধ্যাত্মিকতার কোনো ছোঁয়া নেই।[১৫]

ইসলামি জীবনাচরণ

ইসলামি জীবনযাপনজুড়ে আছে পাঁচটি মৌলিক অনুশীলন। প্রতিটি মুসলিম নরনারীর এ পাঁচটি কাজকে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বানিয়ে নিতে হয়। এ আচারাদিগুলোকে বলা হয় 'আরকানুল ইসলাম' বা 'ইসলামের ভিত্তি বা স্তম্ভ'। এ পাঁচটি মূল স্তম্ভ হলো একধরনের ওয়েক আপ কল, যা

[১৩] সূরা আস সফ : ১০-১৩
[১৪] সূরা ইনফিতার : ৬-৯
[১৫] সূরা বাইয়্যিনাহ : ৫

আমাদের মন ও অন্তরকে প্রশান্ত করে। ফলে আমরা বারবার জীবন সম্বন্ধে বিশুদ্ধ ধারণা লাভ করি এবং দুনিয়ায় আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠি।

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ হলো শাহাদাহ বা সাক্ষ্য দেওয়া, সালাত বা নামাজ, জাকাত, সাওম বা রোজা এবং হজ। এই আমলগুলোর কোনোটা প্রতিদিন করতে হয় আবার কোনোটা জীবনে একবার করলেও হক আদায় হয়ে যায়। ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন—

> 'পাঁচটি স্তম্ভের ওপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত। এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রাসূল, সালাত কায়েম করা, জাকাত আদায় করা, হজ পালন করা এবং রমজান মাসের সিয়াম পালন করা।'[১৬]

প্রথম স্তম্ভ তথা শাহাদাহ'র বিষয়ে এর আগে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। মূলত শাহাদাহ হলো একটি ঘোষণা। একজন মানুষ তখনই শাহাদাহ বা ঘোষণার জানান দেয়, যখন সে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর নিকট সমর্পণ করে তথা মুসলিম হয়ে যায়। কোনো ব্যক্তি আন্তরিক ও একনিষ্ঠভাবে এ ঘোষণা দেওয়ার আগ পর্যন্ত সত্যিকারের মুসলিম হতে পারে না।

এমনকি যদি সে ব্যক্তি কোনো মুসলিম পরিবারে জন্ম নেয়, তবুও নয়। এ ঘোষণাই একজন মুসলিমকে কাফিরদের থেকে আলাদা করে দেয়। প্রথমবার শাহাদাহ'র ঘোষণা দেওয়ার পর একজন মানুষ ইসলামের ভেতর প্রবেশ করে এবং তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। সাক্ষ্য দেওয়ামাত্রই একজন মানুষের হিসাব-নিকাশ নতুন করে শুরু হয়। অর্থাৎ গুনাহমুক্ত হয়ে সে রীতিমতো সদ্য ভূমিষ্ঠ মাসুম বান্দায় পরিণত হয়ে যায়।

ইতিবাচকতা ও নেতিবাচকতা

শাহাদাহ বা সাক্ষ্য দেওয়ার ঘোষণাটির দুটি অংশ আছে। প্রথম অংশে একটি বিষয়কে খারিজ করা হয় আর দ্বিতীয় অংশে অন্য একটি বিষয়কে দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করা হয়। কালিমা শাহাদাতে এই ঘোষণাই দেওয়া হয়—

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ-

> 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক ও একক, তাঁর কোনো শরিক বা অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহ তায়ালার অতি প্রিয় খাস বান্দা ও তাঁর প্রেরিত রাসূল।'

[১৬] বুখারি ৮; মুসলিম ১৬; তিরমিজি ২৬০৯; নাসায়ি ৫০০১; মুসনাদে আহমাদ : ৬০১৫; সহিহ ইবনু খুজায়মা : ১৮৮০

ইসলাম

অ্যা কমপ্লিট কোর্স ফর বিগেনারস

ইয়াহিয়া এমেরিক

অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর

৪

(নবিগণের পরিচয়)

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

অধ্যায়-১

প্রাচীন সময়ের গল্প

আদম ও হাওয়া (আ.) কে ১৫
নুহ (আ.) ও মহাপ্লাবন ২২
হুদ (আ.) ৩০
ইবরাহিম (আ.)-এর কার্যক্রম ৩৯
তিনজন অজানা নবি ৫৫
ইউসুফ (আ.)-এর গল্প ৫৯

অধ্যায়-২

বনি ইসরাইল

নীলনদ থেকে মরুভূমি ৭৫
মুসা (আ.) ৮৪
পরবর্তী ঘটনাবলি ৯৫
সোলায়মান (আ.) ও বিলকিস ১০৭
দুই শিংয়ের অধিকারী ১১৮

অধ্যায়-৩

ঈসা (আ.)-এর উত্তরাধিকার

ইমরানের পরিবার ১২৭
একজন মহীয়সীর সংগ্রামী জীবন ১৩৫
যে বার্তা রয়েছে ইনজিলে ১৪১
গুহায় ঘুমন্ত যুবকেরা ১৫৭

আদম ও হাওয়া (আ.) কে

এই আলোচনায় ফোকাস করা হয়েছে—আমাদের আদি পুরুষদের অভিজ্ঞতা যেমন ছিল।

প্রথম মানুষ

আগে আমরা পৃথিবীতে আগত প্রথম মানুষদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছি। এটাও জেনেছি—আল্লাহ তায়ালা মানুষকে ইচ্ছেমতো চলার স্বাধীনতা দেওয়ার আগে এ সুযোগটি বিশ্বজগতের আরও অনেক সৃষ্টিকে দিয়েছিলেন। দায়িত্বের ভার সামলাতে পারবে না; এ আশঙ্কায় তারা কেউ সাহস করেনি।

এরপর আল্লাহ মানুষকে এ দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব দেন এবং মানুষ তা গ্রহণ করে। তখন আল্লাহ পৃথিবীতে তাঁর খলিফা নিয়োগের ঘোষণা দিলেন।[১৭] ফেরেশতারা দেখলেন, আল্লাহ মানুষকে চিন্তা ও কাজের স্বাধীনতা দিয়ে সৃষ্টি করছেন। তারা তখন আশঙ্কা করলেন, মানুষ পৃথিবীতে নৈরাজ্য ও ফ্যাসাদ সৃষ্টি করতে পারে।

অবশ্য আল্লাহ তাঁর কাজের পরিণতি সম্পর্কে ছিলেন পুরোপুরি অবহিত। তাই তিনি ফেরেশতাদের আশ্বস্ত করলেন। জানালেন, খুব শীঘ্রই মানুষকে তাঁদের সিজদা করতে হবে।[১৮] আল্লাহ মানুষকে পূর্ণ আকৃতি দিলেন এবং তাদের থাকার সুযোগ প্রদান করলেন বেহেশতের একটি জঙ্গলে। একটা সময় প্রথম মানব দম্পতি আদম ও হাওয়া (আ.)-এর বোধোদয় ও জ্ঞান পূর্ণমাত্রায় জাগ্রত হলো। তখন আল্লাহ তাঁদের চারপাশের পরিবেশকে চিনে নেওয়া ও অনুভব করার সক্ষমতা দিলেন। মূলত এটাই হলো মানুষের আত্মসচেতনতার প্রথম বহিঃপ্রকাশ।

এরপর আল্লাহ পার্থিব পরিবেশ ও এর উপকরণসমূহ ব্যাখ্যা করার জন্য ফেরেশতাদের নির্দেশনা প্রদান করলেন, কিন্তু ফেরেশতারা কাজটি করতে পারল না। অতঃপর আল্লাহ ফেরেশতাদের সামনেই তুলে ধরলেন তাঁদের তুলনায় আদম (আ.)-এর জ্ঞানের ব্যাপকতা। ফেরেশতারা যেসব উপকরণের নাম বলতে পারেননি কিন্তু আদম (আ.) অবলীলায় বলে দিলেন। ফেরেশতারা এ ঘটনায় বিস্মিত হলেন এবং তাঁরা আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী অবনত হয়ে সিজদা করলেন আদম (আ.)-কে।[১৯]

---

[১৭] সূরা বাকারা : ৩০

[১৮] সূরা সোয়াদ : ৭১-৭২

[১৯] সূরা বাকারা : ৩০-৩৪

মানুষের আগে আল্লাহ আরও একটি জাতি সৃষ্টি করেছিলেন। তারা হলো জিন। এদের মধ্যে একজন ছিল ইবলিস; যে কি না আদম (আ.)-এর সামনে ফেরেশতাদের সিজদা দেওয়ার দৃশ্য অবলোকন করেছিল।[২০] সে ফেরেশেতাদের সাথে দলবদ্ধভাবে সিজদা করা থেকে বিরত ছিল।[২১] আল্লাহ তখন ইবলিসকে প্রশ্ন করলেন—'হে ইবলিস! তোমার কী হলো, তুমি সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলে না?'[২২]

ইবলিস তখন অহংকার ও দম্ভের প্রভাবে কাবু হয়েছিল। তাই অহংকার আর বৈষম্যের তাড়নায় উত্তর দিলো—'আপনি আমাকে আগুন থেকে তৈরি করেছেন আর তাকে তৈরি করেছেন পচা কাদামাটি থেকে।'[২৩] অর্থাৎ, ইবলিস নিজে আগুনের তৈরি হওয়ায় সে মাটি থেকে তৈরি আদম (আ.)-কে সিজদা করাটা সঠিক মনে করেনি। আর এটা তার অহংকার ও ঔদ্ধত্যের পরিচয়।

ইবলিস আদেশ অমান্য করায় আল্লাহ তাকে বহিষ্কার করলেন। অথচ বোকা ইবলিস চ্যালেঞ্জ করে বসল স্বয়ং আল্লাহকে। সে কিছু সময় অবকাশ দেওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে অনুরোধ করল, যাতে মানুষকে পথভ্রষ্ট ও বিচ্যুত করতে পারে তার কৌশল দ্বারা। মানুষকে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া থেকে বিরত রাখতে পারার মধ্যেই সে সফলতা খুঁজে নিল। ইবলিস মূলত এসব অপকর্মের মাধ্যমে মানুষের তুলনায় জিনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছিল।[২৪]

বস্তুত আল্লাহ তায়ালা এমনই এক সত্তা, যাকে চ্যালেঞ্জ করা যায় না। কিন্তু ইবলিস সেই ধৃষ্টতা করায় আল্লাহও তাকে সুযোগ করে দিলেন। তিনি ইবলিসকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত আয়ু দান করলেন এবং তাকে সুযোগ দিলেন অবাধে পাপ কাজ করারও।[২৫] ইবলিসও বুঝতে পারল—যারা আল্লাহতে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, তাদের সে কখনোই পথভ্রষ্ট বা বিচ্যুত করতে পারবে না। অন্যদিকে আল্লাহও জানিয়ে দিলেন, তিনি মানুষের জন্য হিদায়াত প্রেরণ করবেন। এরপরও যারা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে লাঞ্ছিত ও শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে ইরশাদ করেন—

> 'যারা আমার বান্দা, তাদের ওপর তোমার কোনো ক্ষমতা নেই, কিন্তু পথভ্রান্তদের মধ্য থেকে যারা তোমার পথে চলে, তাদের সবার নির্ধারিত স্থান হচ্ছে জাহান্নাম।'[২৬]

অন্যদিকে ইবলিস জানাল—সে চারদিক থেকে মানুষকে আক্রমণ করবে এবং মানুষের মাঝে আবেগ ও প্রবৃত্তি সৃষ্টি করে তাকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করবে সত্যপথ থেকে।[২৭] আল্লাহ তায়ালা

---

[২০] সূরা কাহাফ : ৩০
[২১] সূরা বাকারা : ৩৪; সূরা হিজর : ৩২
[২২] সূরা হিজর : ৩২
[২৩] সূরা আ'রাফ : ১২; সূরা হিজর : ৩২-৩৩
[২৪] সূরা হিজর : ৩৯
[২৫] সূরা হিজর : ৩৬-৪৩
[২৬] সূরা হিজর : ৪২
[২৭] সূরা নিসা : ১১৯

তখন ইবলিসকে জানিয়ে দিলেন—যেসব মানুষ ও জিন আল্লাহকে অগ্রাহ্য করে হিদায়াতের পথ ছেড়ে ইবলিসের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, তাদের দ্বারাই পূর্ণ হবে জাহান্নাম।[২৮]

ইবলিস মনে করেছিল, সে তার চেষ্টায় সফল হবে। কিন্তু সে জানত না, আল্লাহ মানুষকে বেশ কিছু প্রতিরক্ষা সিস্টেম দিয়ে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। মানুষকে চিন্তার স্বাধীনতা দেওয়ার পাশাপাশি বুদ্ধিমত্তা ও যৌক্তিকতাও দেওয়া হয়েছে। তাই গড়পড়তায় সব মানুষই পথভ্রষ্ট হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

এদিকে আদম ও হাওয়া (আ.) আল্লাহ নির্ধারিত দৃষ্টিনন্দন এক বাগিচায় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে সময় অতিবাহিত করছিলেন। বিশ্রাম, আরাম-আয়েশ ও সন্তুষ্টির সাথে কাটছিল তাঁদের দিনগুলো। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদের জন্য কেবল একটিই নির্দেশনা ছিল। আর তা হলো—আল্লাহ তাঁদের বিশেষ একটি গাছের কাছে যেতে নিষেধ করেছিলেন। ওই নির্দিষ্ট গাছের নিচে গেলে তাঁরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে, আর তা হতে পারে সমূহ সর্বনাশের কারণ।

আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ পালনে প্রথমদিকে আদম ও হাওয়া (আ.) উভয়েই ছিলেন এ বিষয়ে খুবই সতর্ক। পাশাপাশি তাঁদের নিয়ে শয়তানের সার্বক্ষণিক চক্রান্ত প্রসঙ্গেও সচেতন করেছিলেন আল্লাহ তায়ালা। তিনি বলেছিলেন—

> ‘অতঃপর আমি বললাম—ও হে আদম, এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু। সুতরাং সে যেন জান্নাত থেকে তোমাদের বের করে না দেয়, তাহলে তোমরা কষ্টে পতিত হবে।’[২৯]

কিছুদিন পর শয়তান আদম ও হাওয়া (আ.)-এর শুভাকাঙ্ক্ষীবেশে ওই বাগানে চলে আসে। সে তাঁদের প্ররোচিত করতে শুরু করে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে।[৩০] শয়তান তাঁদের জানায়, আল্লাহ তাঁদের যে গাছের কাছে যেতে নিষেধ করেছেন, মূলত ওই গাছটি জাদুকরি। তাই তারা ওই গাছের ফল খেলে চিরস্থায়ী জান্নাতি হয়ে যাবে। শয়তান আরও বলে—‘হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দেবো অনন্তকাল জীবিত থাকার বৃক্ষের কথা এবং অবিনশ্বর রাজত্বের কথা?’[৩১]

---

[২৮] সূরা নিসা : ১২১
[২৯] সূরা ত্ব-হা : ১১৭
[৩০] সূরা নিসা : ১২০
[৩১] সূরা ত্ব-হা : ১২০

ইসলাম

অ্যা কমপ্লিট কোর্স ফর বিগেনারস

ইয়াহিয়া এমেরিক

অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর

৫

(মুহাম্মাদ সা. ও সাহাবিদের জীবনী)

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

অধ্যায়-১

সর্বশেষ বার্তাবাহক

৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে পৃথিবীর চেহারা ১৫
কুরাইশ কারা ছিল ২০
মুহাম্মাদ (সা.)-এর জন্ম ২৫
যুবক এক ব্যবসায়ী ৩২
আল্লাহ কীভাবে তাঁর নবিদের বাছাই করতেন ৩৮

অধ্যায়-২

সংগ্রামের সূত্রপাত

সর্বাগ্রের সেনানীরা ৪৯
মক্কাবাসীর নির্যাতন ৫৬
আবিসিনিয়ায় হিজরত ৬৭
আকাবার শপথ ৮২

অধ্যায়-৩

মুসলিম জাতির আবির্ভাব

নতুন যুগে প্রবেশ ৯১
একটি শহরের পুনর্নির্মাণ ১০০
বদরের যুদ্ধ ১০৭
উহুদের যুদ্ধ ১১৫
আবারও ঝড়ের পূর্বাভাস ১২৫
এবার মদিনা অবরোধ ১৩১

অধ্যায়-৪

চূড়ান্ত বিজয়

মক্কা যেভাবে মুক্ত হলো	১৪৭
হুনাইন ও তাবুক	১৬২
দায়িত্বের পরিসমাপ্তি	১৭৭
নবিজির প্রতিচ্ছবি	১৮৪
উম্মে সালামা (রা.)	১৯৫
মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা.)	২০২
বিড়ালছানার ভক্ত যিনি	২০৬
ফাতিমা (রা.) : অমূল্য যে রতন	২১১
সালমান আল ফারসি (রা.)	২১৯
জুলাইবিব (রা.)	২২৭
আবু জর আল গিফারি (রা.)	২৩১
আসমা বিনতে আবু বকর (রা.)	২৪০
আরও কয়েকজন সম্মানিত সাহাবি	২৪৭

৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে পৃথিবীর চেহারা

এই আলোচনায় ফোকাস করা হয়েছে—একটি সভ্যতার অর্জিত সফলতা ছাপিয়ে যেতে আরও যে সকল সম্ভাবনা ও সুযোগ থাকতে হয়।

ইসলাম কী

৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে বিশ্বের যেসব স্থানে মনুষ্য বসতি করে–এমন সব অঞ্চল ছিল সাম্রাজ্যগুলোর অধীনে। আর সাম্রাজ্যগুলো পরিচালিত হচ্ছিল স্বৈরাচারী ও আগ্রাসী শাসকদের দ্বারা। পশ্চিমা রোমান সভ্যতা নানাদিক থেকে বারবারিকদের আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে যায়। এর ফলে ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা আর এশিয়া মাইনরের বিশাল এলাকাজুড়ে প্রতিষ্ঠিত হয় বাইজেন্টাইন রোমানদের একক আধিপত্য। মধ্যপ্রাচ্যে ছিল পারস্য সাম্রাজ্যের প্রভাব, যা প্রাথমিকভাবে মেসোপটেমিয়া অঞ্চল থেকে উদ্ভূত হলেও পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষ ও মধ্য এশিয়ার সীমানাঘেঁষে পৌঁছে গিয়েছিল ফিলিস্তিন পর্যন্ত।

অন্যদিকে ভারতবর্ষ অনেকগুলো রাজ্যে বা প্রদেশে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। চীনে চলছিল হান রাজবংশের শাসন। যদিও প্রতিদ্বন্দ্বী জেনারেলদের মধ্যে পরস্পর বিবাদের কারণে ততদিনে চীনা রাজবংশের শাসনেও নৈরাজ্য আর ফাটল দেখা দিয়েছিল। তবে তৎকালীন সময়ের সবচেয়ে বড়ো বিভেদ ও সংঘাত ছিল বাইজেন্টাইন ও পারস্য সাম্রাজ্যের মাঝে। বাইজেন্টাইনরা ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে ছিল খ্রিষ্টান আর পারসিকরা ছিল জরথুস্ত্র অর্থাৎ অগ্নিপূজারি। প্রায়শই এ দুই পরাশক্তি যুদ্ধে জড়িয়ে যেত। একে অন্যের ভূখণ্ড দখল করার কিংবা কৌশলগত ফায়দা হাসিল করার চেষ্টার অন্ত রাখত না।

বেশিরভাগ সময় এ দুই পরাশক্তির যুদ্ধ হতো সিরিয়া, আর্মেনিয়ায় কিংবা ফিলিস্তিনে। শত শত বছর ধরে এ দুই পরাশক্তির মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে আসছিল। কোনো একটি যুদ্ধে হয়তো একপক্ষ জিতত, আবার আরেক যুদ্ধে হয়তো অন্যপক্ষ। তবে এসব যুদ্ধের পরিণতিতে এই সাম্রাজ্যগুলোর শহর আর জনজীবনের পরিণতি হয়ে উঠত অত্যন্ত নাজুক ও বিষাদময়।

স্থবিরতা থেকে শিক্ষা

তৎকালীন সময়ের পরাশক্তিগুলো যুদ্ধ বা যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার কাজেই সিংহভাগ সম্পদ ব্যয় করত। তাই এ সাম্রাজ্যগুলোর অন্যান্য স্বাভাবিক কার্যক্রম বিশেষ করে স্কুল পরিচালনা, চিত্রশিল্পী, পড়াশোনার মতো কাজের জন্য তেমন কোনো অর্থ বরাদ্দ করা হতো না। ফলে জ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত বিশাল জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই লিখতে-পড়তে পর্যন্ত জানত না।

তাদের কাছে বইপুস্তক খুবই বিলাসী ও মূল্যবান পণ্য হিসেবে বিবেচিত হতো। ফলে সমৃদ্ধশালীরাই কেবল বই পড়ার সুযোগ গ্রহণ করত। স্কুল-কলেজেও ধনীদের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হতো। আর যারাও-বা স্কুলে যেত, কেবলই সীমাবদ্ধ থাকত ধর্মীয় শ্লোক ও সামান্য আচারাদি শিক্ষায়। কিশোরী বা মহিলাদের জন্য শিক্ষা পাওয়ার কোনো সুযোগ মোটেই ছিল না।

নিত্যনতুন যা আবিষ্কৃত, সেগুলোর অধিকাংশই ছিল যুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত। গণিত বা নগর পরিকল্পনায় নতুন কোনো চিন্তায় কারও আগ্রহ ছিল না; বরং জব্দকৃত সমরাস্ত্র এবং যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় স্টিল নির্মাণ কৌশল নিয়ে তৎকালীন রাজা-বাদশাহ বা সমরপতিদের আকর্ষণ ছিল।

পড়াশোনা বা অধ্যয়নের প্রক্রিয়াও হয়ে পড়েছিল একদম স্থবির। ভবিষ্যৎও ছিল বড্ড আঁধারে ঘেরা, অস্পষ্ট। মানবাধিকার বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। ছিল না তেমন কোনো আইন-শৃঙ্খলা। ডাকাত বা জলদস্যুদের দৌরাত্ম্য ছিল আশঙ্কাজনক। স্থানীয় নেতারা নিজেদের ইচ্ছেমতো লোকজনের কাছ থেকে উচ্চহারে কর আদায় করে নিত।

খ্রিষ্টধর্মের অবস্থা

তৎকালীন সময়ে খ্রিষ্টধর্ম প্রধানত ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা ও ফিলিস্তিনে বিকশিত হয়েছিল। তবে অধিকাংশ স্থানেই খ্রিষ্টধর্ম যেভাবে পালিত হতো, তার সাথে ঈসা (আ.) প্রচারিত শিক্ষার তেমন কোনো সাদৃশ্য ছিল না। রোমান সাম্রাজ্য খ্রিষ্টধর্মকে নিয়ন্ত্রণ করত ইচ্ছেমতো। ইচ্ছে হলেই বানিয়ে নিত নতুন নতুন সংঘ বা গির্জা। রোমান অধিপতিরা নানা স্থানে ক্যাথলিক চার্চ নির্মাণে সহযোগিতা করত। উল্লেখ্য, ক্যাথলিক শব্দের অর্থ হলো সর্বজনীন।

ক্যাথলিক চার্চের প্রতিষ্ঠা শুরু হয় ঈসা (আ.)-এর অন্তর্ধানের ৪শ বছর পর। এই চার্চগুলোতে অনুশীলন ও অনুসরণ করা হতো পলের শিক্ষার আলোকে ত্রিত্ববাদের রীতিনীতি। ক্যাথলিক চার্চগুলোতে শেখানো হতো যে, ঈশ্বরের তিন রূপের বিস্তারিত বিবরণও সেই বিশ্বাস মজবুতকরণ।

প্রথমদিকে চার্চে বিশ্বাসীরা আরও কিছু অদ্ভুত ধারণায় বিশ্বাস রাখতেন। যেমন : শুধু চার্চের আনুষ্ঠানিক সদস্যরাই স্বর্গে যেতে পারবেন। তারা আরও মানতেন, চার্চগুলোর প্রধান অর্থাৎ পোপ

হিসেবে যিনি দায়িত্বপালন করতেন, স্বর্গে যাওয়ার জন্য তার একনিষ্ঠ আনুগত্য করাও প্রয়োজন। তখনকার সময়ে বিশ্বাস করা হতো—পোপের সাথে ঈশ্বরের সরাসরি যোগাযোগ আছে এবং পোপ কখনোই ভুল করতে পারেন না। পোপ চাইলে যে কাউকে স্বর্গে বা নরকে পাঠাতে পারেন। যাজকরা মানুষের পাপ মোচন করারও ক্ষমতা রাখেন বলে তখন দাবি করা হতো।

৩২৫ সালে ল্যাটিন ভাষায় বাইবেল সন্নিবেশিত হয়। যারা চার্চের আনুষ্ঠানিক প্রথা বা রীতিতে বিশ্বাস করত, শুধু তারাই বাইবেল পড়ার অনুমতি পেত; বাকি লোকেরা বাইবেল স্পর্শও করতে পারত না। তারা জানতও না যে, বাইবেল পড়ার নিয়মনীতি কী। শুধু যাজকরাই জনগণের সামনে উপস্থাপন করতে পারতেন বাইবেলের আংশিক ব্যাখ্যা; যদিও তা মনগড়া। কিন্তু এর বাইরে জানার সুযোগও ছিল না জনসাধারণের।

চার্চে নারীদের অধিকার খুব সামান্যই বিদ্যমান ছিল। এখনকার সময়ের খ্রিষ্টান নারীরা যেমন বাইবেল একেবারেই মানে না, তখনকার সময়ে অবশ্য পরিস্থিতি কিছুটা ব্যতিক্রম ছিল। তৎকালীন সময়ে বাইবেলের একটি নিয়ম ছিল—নারীরা চার্চের ভেতর কথা বলতে বা প্রশ্ন করতে পারবে না। সোনা-রুপা, হীরে-জহরত, মুক্তা বা অন্য কোনো অলংকার পরিধান করতে পারবে না। মাথায় স্কার্ফ না পরে কোনো নারী চার্চে প্রবেশ করত না। তারা চার্চে কোনো পদে যেতে পারবে না। সব সময়ই নজর রাখা হতো, যাতে পদায়নের মাধ্যমে নারীকে যেন পুরুষদের চেয়ে বেশি ক্ষমতা না দেওয়া হয়।[৩২]

এসব বিবরণ পড়েই জনসাধারণের ওপর ক্যাথলিক ও চার্চগুলোর প্রভাব বোঝা যাচ্ছে। এ ছাড়া চার্চগুলো জনগণের কাছ থেকে বিপুল অঙ্কের কর আদায় করত এবং ওই টাকা দিয়ে চার্চের দায়িত্বশীলদের জন্য ক্যাথেড্রাল ও বিলাসী বাসভবন নির্মাণ করত। কেউ যদি চার্চ প্রদত্ত শিক্ষাসমূহ অমান্য করার কথা ভাবত, তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে তাকে কাফির বা অবিশ্বাসী তকমা দিয়ে তার ওপর চালানো হতো অমানুষিক অত্যাচার।

[৩২] করিনথিয়ানস : ১৪ : ৩৪-৩৫, ১১ : ১-১০ তিমোথি-২ : ৯-১৫